দ্বারকেশ্বর নদীচরে পীরের উরস। ছবি ঃ সংগৃহীত

নিরগিন শাহ পীরের উরস

রুদ্র শংকর দাস

(১)

"প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী। কিন্তু উৎসবের দিন মানুষ বৃহৎ; সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ; সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ"-বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের একথন যথার্থ। উপলক্ষ যাই হোক না কেন উৎসবের মধ্যে এক সর্বজনীন রূপ আছে। সামাজিক - ধর্মীয় - অর্থনৈতিক কিংবা শারীরিক - কোন বিভাজনই এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এ এক বর্ণময় প্রাণচঞ্চল আনন্দ পূর্ণ জীবন ছবি প্রকাশ করে মাত্র।

হ্যাঁ, এমনি এমনই এক মিলন ক্ষেত্র হল মেলা যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি - ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রকাশ ক্ষেত্রে পরিনত। মৃৎশিল্প কারুপন্য বিকিকিনির সাথে সাথে যাত্রাপালা, পুতুল নাচ, নাগরদোলা, জারি-সারি-পীর গান, রামায়ণ, মোরগ লড়াই, লাঠিখেলা দর্শনার্থীদের টেনে আনে এমন সব মিলনস্রোতে। তেমনি এক 'টান', সত্যিকারের 'মিলন-মেলা'; মানুষে মানুষে গড়ে তোলা অপূর্ব সম্প্রতির বন্ধন 'পীর বাবা হজরত নিরগিন শাহ-র মেলা' যা বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

বর্ধমান রাজার এলকাভুক্ত সেদিনের 'রাজহাট বীরসিংপুর ' অধুনা বীরসিংহ পুর দ্বারকেশ্বর নদী তীরের ব্যস্ত বানিজ্য কেন্দ্র ছিল। পার্শ্ববর্তী মল্লরাজত্বের মত খ্যাতি না থাকলেও অঞ্চলটি স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল ছিল। মৌখিক কিছু তথ্য সুত্রে জানা যায় বর্ধমান রাজার কাছ থেকে এই অঞ্চলের জমির পত্তনি বন্দোবস্ত নেওয়া দেওয়ান সূর্যকান্তদের গোমস্তা ছিলেন নিরগিন শাহ। এই অঞ্চলের কুঁদি গ্রামেই প্রথম তাঁর দর্শন মেলে। প্রশাসক বা খাজনা আদায়ের সময় খুব কাছ থেকে সাধারণ মানুষের সহজাত সরলতা ও কষ্টের জীবন

দেখেছেন। আর তাঁর ধর্ম ভাবনা বিদ্ধ হয়ে থাকবে এমন জীবনপট দ্বারা। তাই হয়তো মুসলিম সম্প্রদায়ের 'বাতেনি'/'আশরফ' সম্প্রদায় ভুক্ত সাধকদের মত উচ্চ বংশীয় বা সুলতানদের স্নেহ ধন্য অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসেন ও আনুমানিক ১৬৩৭ সালের দিকে তিনি চলে আসেন রাজহাট বীরসিংপুর গ্রামে। ততদিনে 'জাহেলি আতরফ' ভক্তিবাদে তিনি হয়ে ওঠেন পীরবাবা - প্রকৃত সন্ন্যাসী। রাজহাট বীরসিংপুর'- এর একপ্রান্তে এই নদীর তীরেই ছিল তাঁর সাধনক্ষেত্র। অবশ্য নদীখাত আজ যেখানে বইছে সেখানেই ছিল সেদিনের সুন্দর গ্রামীণ জীবন (মৌজা বীরসিংপুর-জে, এল, নং.- ৯৭)। প্রায় মোট ৭৪২ (মতান্তরে ৭৫২) ঘর রাজহাটি তাম্বুলি, রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী মেরেলি থাক তন্তুবায় ও সুবর্ণ বণিক বা পোদ্দার সম্প্রদায় নিয়ে ছিল সেদিনের জনপদ। উল্লেখ মেলে ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে গ্রামের অধিবাসী উমা দত্ত বাঁকুড়া শহরের রামকিষন মারোয়াড়ীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। যা আজও শহরের বুকে 'উমাদৎ রামকিষণ' রূপে বর্তমান।

তেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলায় মুসলমান শাসনের পত্তন হলেও বাঁকুড়া জনপদ সহ সারা জঙ্গলমহল এলাকায় প্রায় চারশো বছর তার ছায়াপাত ঘটেনি। বাঁকুড়া ও সন্নিহিত বিস্তৃত এলাকা ছিল মল্লরাজাদের এবং পরে অংশত বর্ধমান রাজ শাসনে। মোঘল সম্রাট শাজাহানের রাজত্ব কালে বাংলার সুবাদার যুবরাজ সুজা। তাঁর আমলে বর্ধমান রাজ বংশের আবু রাই ১৬৫৭ তে মোঘল আনুগত্য স্বীকার করে 'মোঘলটুলির কোতোয়ালি' ও 'চৌধুরী' পদ লাভ করেন। পরে তাঁর নাতি কৃষ্ণ রাম রাই সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফরমানে জমিদার রূপে স্বীকৃত। প্রত্যক্ষ মুসলমান শাসন না থাকায় স্বভাবতই বাঁকুড়া জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা বিস্তারের তেমন সুযোগ ছিল না। যেটুকু ঘটেছে তা ইসলাম ধর্মের প্রচারক সুফী সাধক, পীর, দরবেশ ফকির, আউলিয়াদের উদ্যোগে। সে কারণে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির তুলনায় এখানে মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট কম। যেমন, বর্ধমানের ২০.৭, হুগলিতে ১৫.৭, আর বাঁকুড়ায় এই সংখ্যা ৪ শতাংশ মাত্র। আলোচ্য বীরসিংপুর ও সন্নিহিত এলাকাতেও মুসলিম জনবসতি নেই বললেই চলে।

মুসলমান শাসন পত্তনের গোড়ার দিকে বাংলার সমাজে যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত দেখা দিয়েছিল, দীর্ঘ দিন। পাশাপাশি অবস্থানের ফলে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের ভক্তিবাদী তথা সমন্বয়পন্থী ভাবধারার প্রচারে তা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়। হিন্দুদের বৈষ্ণব আদর্শের মত ইসলাম ধর্মের সুফী ভাবনা সেই সমন্বয়ের বার্তাবাহী। অর্থের আড়ম্বরে বিশ্বাস না করা, নৈতিকতার অবক্ষয়ের বিরোধিতা করা ও ভালোবাসাই ভগবানের সাথে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা - এই ভাবনায় বিশ্বাসী সুফী ধর্মগুরুরা মানুষের খুব কাছের ও প্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁরাও সকল ধর্মের প্রতি ছিলেন উদার ও সমদৃষ্টি সম্পন্ন। মুইনউদ্দিন চিস্তিত, সুহরা বর্দী, নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, নাসিরউদ্দিন - প্রভৃতি ধর্ম গুরুদের বাণী, ধর্মপথ হিন্দু-মুসলিম এমনকি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ ও সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে থাকেন। ফলে বেশ কিছু স্থানে ধর্মান্তরিকরনের উল্লেখ মেলে। আর তাই মুসলিম পীর বাবা ও হিন্দু সত্যনারায়ণ ঠাকুর একীভূত হন ''সত্যপীর''-এ।

(২)

এমনই এক সুফী ছিলেন এই নিরগিন শাহ। সুফী সাধক হিসেবে সকলকে শুনিয়েছেন

আল্লাহ বা ভগবানের মহিমার কথা। শুনিয়েছেন 'ফানাফিল্লাহ', 'বাকাবিল্লাহ' এবং 'তরিকত'-এর কথা। বুঝিয়েছেন, আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনার দ্বারা মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহ বা ঈশ্বরকে লাভ করতে পারেন। ১৬৫৭ সালে নিরগিন শাহ বাবার মৃত্যুতে বীরসিংপুরের হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতেই প্রতিষ্ঠা পায় তাঁর সমাধি স্থল বা মাজার। আত্মার শান্তি কামনায়, নিজেদের মনস্কামনা পূরণের তাগিদে আজও সকল ধর্মের মানুষের মিলন ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এই অঞ্চল। কেন কি জেলায় অনেকগুলো 'সত্যপীর তলা' বা 'সত্যপীর থান' থাকলেও নিরীগন শাহ পীর (নাঘিংসী পীর) হলেন সত্যপীরদের মধ্যে একমাত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতি বার যা হিন্দুদের কাছে 'গুরুবার' - গুরুর নাম স্মরণ করেই লেগে পড়েন ''ওরশ'' পালনে।

'ওরশ' একটি ফার্সি শব্দ। শিয়া ধর্মাবলম্বী মুসলমানরা যে সুফীবাদে বিশ্বাস করেন, সেখানে তাদের ধর্মগুরুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পালিত হওয়া উৎসব হল 'ওরশ','উরশ'বা 'উর্শ'। অঞ্চলের এই উৎসবে ভক্ত সমাগম ক্রমে রূপ পায় পীর বাবার মেলা। একদিনের এই মেলাতে নানান রকম পসরা সাজিয়ে বসেন যেমন দোকানিরা , তেমনি পীরবাবার বা সত্যপীরের 'দোয়া' বাতলি আশীষ পেতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণ মানুষ মিলিত হন এ মেলাতে। বর্তমান 'খাদেম' শেখ মুস্তাফা মহাশয় জানান তাঁরা ১১ তম উত্তর পুরুষ এ মাজারের। লোকসমাগমে আজ মেলার কলেবর যথেষ্ট বড়। তাই এই জেলার শ্যাম নগর, চাবড়া, পুনিশোল, মুকুন্দপুর, শাপাগাড়া, কেঠারডাঙা, ইদ্‌গাহমোল্লা অঞ্চলের সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ও বীরসিংপুর গ্রামের অধিবাসীদের সহায়তায় গঠিত হয়েছে এক স্থায়ী মেলা পরিচালন কমিটি। বর্তমান মেলা কমিটির সম্পাদক আজাদ আলি মল্লিক মহোদয়। কমিটির এই স্থায়ী পরিচালন কার্যের পাশাপাশি মেলার দিনের লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম সামাল দিতে, তাদের অভাব অভিযোগের খেয়াল ও পূরণ করতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের (সায়রবাগড়া, হরিহর পুর, পাহাড়পুর, কমলপুর, রামনগর, শানতোড়, ওলা সাহাপুর, প্রতাপপুর, কোটালপুর প্রভৃতি) বিশিষ্ট কিছু প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও উৎসাহী গ্রাম্য যুববৃন্দ সতঃস্ফূর্ত যোগদানে মেলার অকৃত্রিম আনন্দ ও সুরক্ষা অমলিন থাকে। পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা ও দক্ষ পরিকল্পনায় মেলার সুবিশাল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হয়। স্বাস্থ্য আধিকারিকের উপস্থিতিতে সামাজিক স্বাস্থ্য বিধির সতর্ক পালন, স্বাস্থ্য শিবির, সচেতনতা মূলক প্রচার চলতে থাকে। করোনা প্রকোপের কথা মনে রেখে এবার থেকে সংযোজিত হয়েছে স্যানিটাইজেশন সেন্টার। নিরাপত্তা বিধি মেনে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকে মেলা চত্বরে।

ভক্তদের শাহী স্নান বা মানত স্নানের প্রয়োজনে অস্থায়ী ঘাট, পানীয় জলের নলকূপ ও শৌচাগার তৈরি করা হয়। নদীর প্রায় জলশূন্য বুকে খাদ্য, মনোহারি দ্রব্য, মনোরঞ্জনের উপকরণ আর ভক্ত বৃন্দের মহামিলনের ভরা জোয়ারের এক আনন্দঘন ঢেউ বয়ে চলে সারা দিন ধরে। কিন্তু উৎসবের শুরুর সময় এমন ছবি ছিল না। মাজারে আগত ধর্মগুরুরা ধর্মকথা ও বাবার নাম মাহাত্ম্য প্রচার করতেই জমায়েত হতেন। তা শুনতে ও নিজেদের মানত পূরণের জন্য পান, সুপারি, কলা, গুড়, দুধ, আটা, পঞ্চ অমৃত, মিষ্টি, চাদর আতর, গোলাপ জল নিয়ে বাবার মাজারে হাজির হন 'খাদেম' ভক্তদের মনস্কামনা পূরণের আবেদন পীর বাবার কাছে পৌছে দেন।

এই অঞ্চলের পীর বাবা নিবগিন শাহ নামের উল্লেখ বাংলাদেশের পীর সংস্কৃতির ইতিহাসে পাই ঈশা খাঁ-র রাজত্ব কালের এক বড় সাধক রূপে। পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারো সিন্ধুর জঙ্গলে পূর্ণ প্রান্তে পাগলের বেশে ঘুরে বেড়াতেন, যা পেতেন তাই খেতেন ও একান্তেই ধর্মসাধনা করতেন। অলৌকিক ভাবে অঞ্চলটি ভরে থাকতো স্বর্গীয় এক খুশবুতে। এখানেও তাঁর মাজার বর্তমান। মুসলিম ও হিন্দু উভয়েরই শ্রদ্ধার স্থান এ মাজার আজ পর্যটন মানচিত্রে ও জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর ভাই শাহ গরীবুল্লাহ অঞ্চলের ১১ জন আউলিয়াদের একজন রূপে পূজিত হন। এগারসিন্ধুর কামানদাগা স্তম্ভের ৩০ হাত উপরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মাজার এখনও বিদ্যমান।

এছাড়া বারাসাত মহকুমার কাজীপাড়া অঞ্চলের এক পীর হজরত নিরগিন শাহ-এর উল্লেখ মেলে। ফকিরের বেশে ঘুরে বেড়াতেন ও কোথাও অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পেলেই সেখানে পৌছে জাতি -ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সাহায্য করতেন। আর্ত মানুষের প্রতি তাঁর এ আচরণ আমৃত্যু পেয়েছে এলাকাবাসী। আর তাই তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় ও আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য গড়া হয় 'দরগাহ' ও রাস্তার নামাঙ্কন করা হয়। যেখানে আজও শ্রদ্ধাবনত ভক্ত বৃন্দ 'শিরনি' ,ধূপ আর বাতি জ্বেলে নতমস্তকে হাজির হন।

কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই প্রায় সমসাময়িক কালে বর্তমান থাকলেও আমি মনে করি একই নামের তিনজন। পীরবাবা আলাদা আলাদা ব্যক্তি। আর তাই আলোচ্য বীরসিংপুরের পীরবাবা নিরগিন শাহ, তাঁর মাজার ও মাজার কেন্দ্রিক মেলা বাঁকুড়ার গ্রামীণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণ মানুষের একান্ত নিজের। এ এক অনন্য সংস্কৃতি। মধ্যযুগের ধর্মীয় আবহের কন্টকাকীর্ণ পরিমণ্ডলে স্বাধীন ভাবে সমান্তরাল ধর্ম সাধনার ও চর্চার ইতিহাস বয়ে চলে এই পীর বা আউলিয়া সংস্কৃতি আগামী প্রজন্মের কাছে এমন ধর্মীয় সহাবস্থান গৌরবময় অধ্যায় খুব একটা আগ্রহের বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ছে না। তাই দেখি মাজারের ধীরে আল্লাহ বা ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে। উন্মুক্ত উদারতা, ভক্তিবাদে ও সাধনায় অত্যন্ত বিশ্বাসের ও শ্রদ্ধার পীরবাবা। বর্তমান সেবাইতের পরবর্তী প্রজন্ম কেউই এই আচারের সঙ্গে যুক্ত নয়। মাত্র ৪ টি পরিবার এখন এই অঞ্চলে অবশিষ্ট আছেন। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত বিচার বিশ্লেষনের যুগেও ভক্তরা গভীর বিশ্বাসে মনস্কামনা পূরণের জন্য তাবিজ, কবচ, জড়িবুটি ব্যবহার করে। রোগ নিরাময়ে ঝাড়ফুঁক ও করিয়ে নিতে আসে।

পূর্ণতার এই আঙনে আরও কিছু নিরাশার ধুলা চোখের স্বচ্ছতা ঝাপসা করে। মাজারের সৌন্দর্য, মেলার আলোকোজ্জল আনন্দ মুখর জৌলুসে ঢাকা পড়ে যায় বর্তমান খাদেম মহাশয়ের সামান্য সরল জীবনচর্যা। সাধনার জীবনে ভোগের আয়োজন শূন্য হলেও বর্তমান আর্থ সামাজিক আবহে এই উদাসীনতা সেবাকার্যের সাথে যুক্ত জীবনকে হতাশার - উপেক্ষার কালগৃহে বন্দি করে দেবে না তো? তেমন হলে ঐতিহ্য মণ্ডিত এই ইতিহাস হারিয়ে যাবে। গ্রামের সরল সহযোগিতা মন ছুঁয়ে যায়, সাগ্রহে তাঁদের কথোপকথনেই উঁকি দিয়ে যায় ইতিহাস। গৌরবান্বিত সেই সময়। গ্রাম ছেড়ে অধুনা কোলকাতার ভবানীপুর - টালিগঞ্জ এলাকায় কিম্বা শহর বাঁকুড়ায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়ী জীবনে রূপান্তরের অজানাকে শ্রোতার সামনে মেলে ধরতে পারার আনন্দে চিক্ চিক্ করা চোখ গুলি দৃষ্টি এড়ায় না। হতাশা নাকি অন্য কিছু -তথ্য ও তত্ত্বগত আলোচনায় মেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ মাননীয়

অনুপ রায় ও প্রতিনিধি রঞ্জিত পড়াল মহাশয়ের আন্তরিক সহযোগিতা হৃদয় ছুঁয়ে গেছে এবং সকল গ্রামবাসীকেও আমার যথাযোগ্য সম্মান।

সরকারি আর্থিক সহযোগিতায় মাজার নিকটবর্তী নদী পাড় বাঁচানোর জন্য পাথরের বাঁধনে যত্নের চিহ্ন দেখি। বেশকিছু স্থায়ী শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা চোখে পড়ে অবশ্যই। এত সবের মধ্যে মাজারের বিশেষ উল্লেখ বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক গৌরব বৃদ্ধি করবে। বিষ্ণুপুরের পর্যটন মানচিত্রে এই এলাকার সূর্য মন্দির, শিবমন্দির ও মাজার যদি যুক্ত হয় তবে গ্রামীণ অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও আকর্ষণীয়।

সবশেষে কোরানের আল ফাতিহার প্রথম সুরাহ উচ্চারণ করি - ''বিসমিল্লা হির রহমান নির রহিম'' (দয়াময় ঈশ্বর আমাদের সঠিক পথে চালিত কর)। সুফী ভাবনার এই প্রাসঙ্গিকতা আজও থাকুক বর্তমান।

লেখক পরিচিতি ঃ লেখক ও ক্ষেত্রসমীক্ষক।